রামসুন্দর জীবনী



শ্রীজীবানন্দ মল্লিক প্রণীত

মূল্য ১৲ টাকা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস
১২নং নারিকেল বাগান লেন হইতে
শ্রীবলাইচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

DEDICATED

to N. Blount Esqr., in all respect and with a deep appreciation of his whole-hearted sympathy and interest in the descendants of Ram Sundar Sikdar,—in India, her aspirations, art and people, coupled with the devout wish he may live to grace Calcutta for many years to come.

Ranaghat,
June 26th, 1918. } *Jibananda Mullick.*



নিবেদন।

প্রিয় সুহৃদ সুলেখক শ্রীযুক্ত অমরেশ শিকদারের সহিত একদিন কথায় কথায় তাঁহাদের বংশ এবং তাঁহার পিতামহ ৺রামসুন্দর শিকদারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। রামসুন্দরের চরিত্রের সামান্ত পরিচয়েই আমি মুগ্ধ হই এবং বন্ধুবরের নিকট রামসুন্দরের একখানি জীবনী লিখিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করি। তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন, এবং তদ্‌ভ্রাতা আমার অগ্রজতুল্য উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত কুমারেশ শিকদার মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। আমরা তখন অষ্টবজ্রে এক হইয়া বর্ত্তমান পাটের ব্যবসায়ীদের শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন এবং তদনুজ সুবিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ ধ্রুবচন্দ্র শিকদার মহাশয়দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হই। দুই ভ্রাতাই আমাকে পুত্রসম স্নেহে তাঁহাদের পিতার জীবনী সম্বন্ধে অনেক অমূল্য উপদেশ দেন এবং প্রয়োজনীয়

উপাদান গুলির সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহাদের মধুর সরল ব্যবহার জীবনে ভুলিবার নয়। আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতার Messrs. Sinclair Murray নামক বিখ্যাত সওদাগরী অফিসের অন্যতম সত্বাধিকারী ইংরাজকুলগৌরব Mr. Blount আমাকে তাঁহার নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতি—

রাণাঘাট,
১২ই আষাঢ়,
সন ১৩২৫ সাল।

বিনীত
গ্রন্থকার

অবতরণিকা

রামসুন্দর জীবনী



জননী বঙ্গভূমি চিরদিনই রত্নগর্ভা। পবিত্র ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর দেখিবে মায়ের সন্তানদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি, প্রবল ধর্ম্মানুরাগ, অলৌকিক আত্মদর্শন। বিশ্ব-গৌরব শচীদুলাল মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভক্তা-বতার ৺রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি এই মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পানে পুষ্ট হইয়াই ধর্ম্মের ভেরীনিনাদ করিতে করিতে ধরাধামে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ও মনীষা মন্দিরপ্রাঙ্গনে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে এখানেও মাতৃভক্ত সন্তানদের অখণ্ড কর্ত্তব্যানুরাগ, অতুলনীয় মাতৃভক্তি, অবিনশ্বর কার্য্যানুষ্ঠান। কবি-কুলশেখর কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মাইকেল মধুসূদন,

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্য-মহারথী দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতিও এই বঙ্গভূমির ক্রোড়ে লালিত হইয়াই পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। মায়ের উর্ব্বর বাণিজ্য-ক্ষেত্রও তাঁহার প্রিয় সন্তান—লক্ষ্মীর বরপুত্রদিগের কীর্ত্তিচ্ছটায় চির উদ্ভাসিত। প্রসিদ্ধ ধনকুবের মতি-লাল শীল, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ পান্তি, রামদুলাল সরকার প্রভৃতিও এই মায়ের শীতল অঞ্চলচ্ছায়ায় বসিয়াই স্বোপার্জ্জিত বিপুল সম্পত্তি সাহায্যে দেশের, দশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর এক মহাপুরুষ যিনি ইঁহাদেরই মত বাণিজ্যের বিশাল-ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের আসনে বসিয়া অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ও দেবদুর্লভ চরিত্র-বলে তদানীন্তন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺রামসুন্দর শিকদারও এই বঙ্গমাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী প্রিয় সন্তানদের অন্যতম। সেই কর্ম্মময় পূত জীবনকাহিনী বর্ণন উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে জীবনী প্রয়োজন কাহার। পৃথিবীতে তো প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ জীবনের উন্মেষ, অবসান ঘটিতেছে। ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, সাধু, অসাধু প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তিরই জীবন স্পন্দন ঘড়ির কাটাটির মত অনন্তকালের বুকে টিক্‌টিক্‌ করিয়া চলিতেছে। কে তাহার সন্ধান রাখে? রাখিলেও অতি অল্পকালমধ্যেই বিস্মৃতি-যবনিকার অন্তরালে তাহার চির সমাধি হয়। ইহাই কালের নিয়ম। প্রতিরোধ করিবার সাধ্য মানুষের নাই। কিন্তু পক্ষান্তরে বহু শতাব্দীর শেষেও পূর্ব্বোক্তদিগের মতই হস্তপদাবলম্বী ঐ যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদিগের জীবন-স্মৃতি সমাজের হৃদয়দর্পণে চির উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাহারই বা প্রতিরোধ কে করিবে?

যে জীবন-সৌধের মনুষ্যত্ব মূল ভিত্তি,—ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, সশস্ত্র সজাগ প্রহরী,—কীর্ত্তি বিজয় নিশান, শত ঝঞ্ঝাবাত রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুগপরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার কণামাত্র ক্ষতিও সংসাধিত হয় না। কালের বুকে সে জীবন-সৌধ উন্নতমস্তকে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান

থাকিয়া পৃথিবীকে যেন নির্ব্বাক্ ভাষায় বলিতে থাকে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ-দেরই জীবনী লোকশিক্ষার জন্য মনুষ্যসমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং এই কারণেই আমাদের আলোচ্য রামসুন্দরের জীবনীর অবতারণা।

চরিত্র আলোচনা ।

রামসুন্দরের সমগ্র জীবন স্বাবলম্বন এবং পুরুষকারের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সহায়সম্বলহীন রামসুন্দর দারিদ্রের ভীষণ কশাঘাত সহ্য করিয়াও বীরের ন্যায়, মনুষ্যের ন্যায় প্রতিকূল অবস্থার সহিত অহরহঃ সংগ্রাম করিতে করিতে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কোন দিন আহার জুটিত—কোন দিন জুটিত না। কিন্তু তাহাতে রামসুন্দরের কি? নির্ভীক অচল অটল রামসুন্দর আপনার কার্য্য করিয়া যাইতেন। কোন প্রকার অবস্থা-বৈগুণ্যই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞান মিলিত হইলেই মানুষ এই ভাবেই গড়িয়া উঠে। তখন সত্যবাদিতা, সৎসাহস, তেজস্বিতা প্রভৃতি আপনা আপনিই অঙ্গের ভূষণ হইয়া পড়ে। কোনরূপ নীচতা, সংকীর্ণতা এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ত্রিসীমানায় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। রাম-

সুন্দরের জীবনে একাধারে এ সমস্ত গুণগুলিই পরিলক্ষিত হইত। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাণিজ্য-প্রতিভা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার অদ্ভুত সংমিশ্রণে তাঁহার চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব ছিল না। সে এক অপূর্ব্ব চরিত্র—কোমলতার সহিত কাঠিন্য, গর্ব্বের সহিত দীনতা। এই উভয় প্রকার বিপরীত মনোবৃত্তির সংস্পর্শে একটা বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য রামসুন্দরের কর্ম্ম জীবনে স্বতঃ পরিস্ফুট ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহার উন্নতির মূল কারণ। ঈশ্বর-অনু-গৃহীত ব্যক্তিরাই এই স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র অধিকারী। আমাদের আলোচ্য রামসুন্দরও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-বলে ঈশ্বর অনুগ্রহেই তাঁহারই দৌত্য লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন।

বংশপরিচয়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত আবাইপুর গ্রামের শিকদার গোষ্ঠী ঐ অঞ্চলের মধ্যে একটী অতি পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত বংশ। ইহারা জাতিতে তিলি এবং ইহাদের আদি উপাধি কুণ্ডু—পরে নবাব-প্রদত্ত শিকদার উপাধিতে খ্যাত। এই বংশের কীর্ত্তিমান্ বংশধর ৺কার্ত্তিকচন্দ্র শিকদার লবণ ও চাউল প্রভৃতির ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং দেশের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাত হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার অনেকগুলি আড়ত এবং গদী ছিল। তন্মধ্যে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর গদীই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। অনেকের ধারণা এই অঞ্চলের শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট নামকরণ তাঁহার নামানুসারেই হয়। এই কার্ত্তিকচন্দ্রের ব্যবসা বাণিজ্য কার্য্যের আর একজন অংশীদার ছিল। সরল কার্ত্তিকচন্দ্র তাহাকে নিজ সহোদরের মত

ভাল বাসিতেন এবং গভীর বিশ্বাসে সমস্ত বিষয়েরই ভার তাহার উপর দিয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ লোভই তাহার কাল হইল। উক্ত অংশীদার বিশ্বাস-ঘাতকায় সরল বিশ্বাসের প্রতিদান দিল। ফলে কার্ত্তিকচন্দ্র হীন অবস্থায় পড়িলেন—একমাত্র পুত্র বাণেশ্বর উপায়ান্তর না দেখিয়া সামান্য চাকুরী-বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না—আর কোথায়ই বা কাহার হইয়া থাকে? যাহা হউক, বাণেশ্বর লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইলেও মা ষষ্ঠীর যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। যথাকালে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে রামচাঁদ জ্যেষ্ঠ, আলোচ্য রামসুন্দর মধ্যম, রাধামোহন তৃতীয়, কৃষ্ণমোহন কনিষ্ঠ।

দেশের ও তৎকালীন তিলি
জাতির অবস্থা।

রামসুন্দরের জন্মের সময় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি শান্তি ও স্বাস্থ্যের আনন্দনিকেতন স্বরূপ ছিল। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধায় তখনও পল্লীগ্রামগুলি জনশূন্য হইতে বসে নাই—লোকের দেহে শক্তি ছিল, মনে বল ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল। এখনকার অস্থিচর্ম্মসার পল্লীবাসীর মত তখন তাহারা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাইত না। তাহার উপর প্রতি গ্রামেই লোকের মরাই-ভরা ধান—বাগান-ভরা ফল—পুকুর-পোরা মাছ। দেশে তখনও বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই—অল্পতেই লোকে সন্তুষ্ট হইত। পরনে ন-হাতি মোটা কাপড়—কোন রকমে হাঁটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে; গায়ে মেরজাই বা পিরিহাণ, তাহাও আবার ৬ মাসে ৯ মাসে কোন কাজকর্ম্ম পূজাপার্ব্বণে গায়ে উঠিত। গ্রামের নিঃসম্পর্কীয় লোকেরাও কেহ দাদা কেহ খুড়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ দেখিলে

ভক্তিভরে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিত। আবার ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রদিগকে স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। 'পেন্নাম গো দাদাঠাকুর'—'কল্যাণ হোক নাতি' ইত্যাদি আন্তরিক শুভেচ্ছাজ্ঞাপক অভিবাদন তখন লোকের মুখে মুখে নিত্য শোনা যাইত। সকালে যে যাহার কাজ কর্ম্মে বাহির হইত—দ্বিপ্রহর বেলায় নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন-স্নানের পর স্বচ্ছন্দচিত্তে আহার সারিয়া লোকে সুস্থ হইয়া বিশ্রাম করিত, সাহেবের তাড়না বা বড়বাবুর বকুনি শুনিবার ভয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ হইবার সুদিন তখনও বাংলায় আসে নাই। সন্ধ্যায় ঘোষেদের বা পালেদের দাওয়ায় দাবা ও পাশা খেলিবার ধুম পড়িয়া যাইত। "কচে বারো," "এই মাৎ", ইত্যাদি চীৎকারে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামগুলি মুখরিত হইয়া উঠিত। দোকানী পশারীরা দোকানের 'টাটে' বসিয়াই সুর করিয়া "ইতেক শুনিয়া রাম" ইত্যাদি পড়িত—নিরক্ষর পল্লীবাসীরা হাঁ করিয়া সেই সুধা পান করিতে করিতে নিজেদের জীবন ধন্য জ্ঞান করিত।

এই সময়ে তিলিজাতির অবস্থা বিশেষ উন্নত। রাজসাহীর দয়ারাম রায়, মুর্শিদাবাদের কান্ত বাবু, রাণাঘাটের কৃষ্ণ পান্তি প্রভৃতির সুযোগ্য বংশধরেরা ধনে মানে খ্যাতিতে বাংলায় তখন সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিলি জাতির মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই স্বাধীন ভাবে ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই সময়ে এক একটী গ্রাম বা কতকগুলি গ্রামের গণ্ডির মধ্যেই তাহাদের বিবাহাদি সামাজিক আদানপ্রদান চলিত—বিভিন্ন সমাজের সহিত পরস্পরের কাজকর্ম্ম একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। সে যাহাহউক, ব্যবসাবুদ্ধির সহিত আর একটী মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধিও তৎকালীন তিলিজাতির অস্থি-মজ্জাগত ছিল—সেটী নিজ উপার্জ্জনে বৃহৎ গোষ্ঠী প্রতিপালন এবং যৌথপরিবারের ভার গ্রহণ। জাতির এই সমস্ত বিশেষত্ব লইয়া রামসুন্দরের জন্ম।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

সন ১২০৮ সালের আষাঢ় মাসে সে বার ভয়ানক বর্ষা। পল্লীগ্রামের পথ ঘাট মাঠ ডুবিয়া গিয়াছে—বাড়ীর উঠানে এক হাঁটু জল। পল্লীবাসীর কষ্টের একশেষ—দুস্থ গৃহস্থদের তো কথাই নাই। মাটীর ঘর—খড়ুয়া চালের ফাঁক দিয়া জল পড়িতেছে। গৃহের আসবাব যেখানে যাহা থাকিবার তাহা সমস্তই ভিজা—স্যাঁতসেতে। এমনই একটা বর্ষার রাত্রে অবিশ্রান্ত বারিপাত ও বিদ্যুৎগর্জ্জনের মধ্যে রামসুন্দর জন্মগ্রহণ করিলেন। গরীবের ঘর—একে গরম কাপড় চোপড়ের অভাব, তাহার উপর স্যাঁক-তাপের কাষ্ঠের অল্পতা। গৃহস্থ ভাবিয়াই আকুল, কি করিয়া সদ্যোজাত শিশুটীর জীবন রক্ষা হয়। মনে মনে দীনের সহায় ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এক প্রতিবেশী উপ-যাচক হইয়া কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ দিয়া গেল—শিশুর

জীবন রক্ষা হইল। যাহা হউক বাণেশ্বরের ভাবনার অন্ত নাই। একে সংসারের সমস্ত ভার তাঁহার উপর—ভরসা সামান্য চাকুরীটা, এদিকে আবার সংসারে পোষ্য বাড়িয়া গেল। কি করিয়া কি হইবে এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইলেন। অবস্থা-বৈগুণ্যে পূর্ব্ব গোশালায় গরু নাই, কিন্তু পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য দুধের প্রয়োজন। দুধ কিনিয়া খাওয়াইবারও সংস্থান নাই। বাণেশ্বর চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু ভগবান যাহার সহায়—কালে যাঁহাকে তিনি ধনে মানে যশে অদ্বিতীয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, সামান্য দুধের অভাব তাহার কি করিবে? প্রতি-বেশীদের নিকট চাহিয়া চিন্তিয়া যে দিন দুধের যোগাড় হইত সে দিন উহাতেই কোনরূপে চলিয়া যাইত। আর যেদিন নিতান্ত তাহাও জুটিত না সে দিন ভাতের মাড়ই দুধের অভাব পূর্ণ করিত। পিতামাতা চক্ষের জলে ভাসিতে থাকিতেন—নয়না-নন্দ ফুল্লকুসমসদৃশ বংশধর—দুধের পরিবর্ত্তে ভাত

হইতে মাড় বাহির করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইতেছে, ইহা ভাবিতেও তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কিন্তু একজন যে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া মনে মনে মৃদু হাস্য করিতেছেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতেন না। মানুষ কাঁদে—বিধাতা পুরুষ হাসে। মানুষ না বুঝিয়া তাঁহার দোষারোপ করে, কিন্তু ভাবিয়া দেখে না এই দুঃখের মধ্য দিয়াই কোন দিন না কোন দিন মঙ্গলময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য ফুটিয়া উঠিবে!

ঈশ্বরের নিয়মে অন্ধকারেই হীরকের সমধিক দীপ্তি—দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যেই মনুষ্যত্বের চরম-বিকাশ। তাই বুঝি একজন খ্যাতনামা লেখক লিখিয়া গিয়াছেন—

It is in misfortune that the character of an upright man shines forth with the greatest lustre.

দুঃখের মধ্যেই শিশু রামসুন্দর শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। সুন্দর শিশুটী—

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—ছবির মত মুখখানি—রং যেন কাঁচা সোণা। লোকে দেখিয়া বলিত, "আহা, সোনার চাঁদ ছেলে।"

যথাসময়ে হাতে খড়ি হইয়া গেল। বাণেশ্বর এইবার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচাঁদ ও তাহাকে একসঙ্গে পাঠশালায় পড়িতে দিলেন। দু'জনের বয়স বেশী তফাৎ নহে—দুই বৎসরের ছোটবড়। দুই ভাই একসঙ্গে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতে গেলেন। গ্রাম্য পাঠশালা—ছেলের সংখ্যা খুব বেশী নহে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি এবং নিম্ন জাতীয়ের ছোট ছোট ছেলেদের লইয়াই এই পাঠশালা। বালক রামসুন্দরের প্রতিভা দেখিয়া গুরুমহাশয় চমৎকৃত হইলেন—পড়ুয়ারাও রামসুন্দরের ন্যায় সহপাঠী পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইল। সকাল ও বৈকালে দু'বেলা পাঠশালা বসিত। পাঠশালায় গিয়া রামসুন্দর দেখিলেন, পিতা মাহিনা দেন মাসিক দুই আনা। উহাতে একজনের মাহিনাই হয়। কিন্তু তাঁহাদের দু'টী ভাইকেই তো পড়িতে হইবে। পিতার

এমন অবস্থা নহে যে সংসারের খরচ চালাইয়া তাহাদের পড়ার জন্য আর অধিক খরচ করেন। এরূপ অবস্থায় হয় তাঁহাকে না হয় ভ্রাতা রামচাঁদকে পাঠশালা ছাড়িতে হইবে। দুই একদিন ভাবিবার পর তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এই বালকের মাথায় মৎলব আসিল। বালক ঠিক করিল এই দুই আনা হইতেই আমরা দু'জনেই পাঠশালায় পড়া চালাইব—আমি পড়িব সকালে, রামচাঁদ পড়িবে বৈকালে। ইহাতে গুরুমহাশয়ের কিছু বলিবার থাকিবে না—অথচ দুইভায়েরই পড়া হইবে। গৃহে আসিয়া রামসুন্দর পিতার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন—পিতা পুত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মিতব্যয়িতার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে পুত্রের মুখ চুম্বন করিলেন। পরে গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "গিন্নি, আর আমাদের ভাবনা নাই—দুঃখের দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার ছেলে রামসুন্দর থেকেই আমাদের বংশের পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরে আ'সবে। কালে এই রামসুন্দর

বিখ্যাত লোক হবে।" পরবর্ত্তী কালে পিতার এই ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

রামসুন্দরের এই অদ্ভুত ধী'শক্তি ও বাণিজ্য-বুদ্ধি (Speculation) দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না— The child is the father of the man ?

পাঠশালায় পড়া চলিতে লাগিল ; কিন্তু এই পাঠ্যাবস্থাতেই সংসারের কতক ভার রামসুন্দরের উপরেই পড়িল। কিন্তু বালক এ বয়সে কি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে তাহাই ভাবিবার বিষয় হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া রামসুন্দর শেষে কড়ির পোদ্দারী করিতেই মনস্থ করিলেন। শ্রীখোলের হাট তখন বিশেষ সমৃদ্ধ। পাঠশালায় পড়ার অবকাশে রামসুন্দর এই শ্রীখোলেই কড়ির পোদ্দারী করিতে লাগিলেন। উপার্জ্জন অতি সামান্য—মাত্র এক আধ পয়সা। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর এই এক আধ পয়সা লইয়া রামসুন্দর বাড়ী ফিরিতেন ! মুখখানি শুষ্ক—দেহ ঘর্ম্মাক্ত—পা দুখানি ধূলাধূসরিত। দারুণ ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক—

আতপতাপে জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুত্ন’টী কোটর-গত। রামসুন্দর বাড়ী আসিয়াই মাতাকে তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিতেন, “মা, বড় ক্ষিধে।” মাতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত—ঘরে এমন কিছু খাবার নাই যে তাহা হাতে তুলিয়া পুত্রকে খাইতে দেন। মাতা অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষের জল মুছিতেন। পুত্রকে লুকাইবার চেষ্টাই পুত্রের জানিবার কারণ হইত। বালক রামসুন্দর মায়ের কোলটীর কাছে গিয়া বসিয়া হাসিমুখে বলিত, “মা, তুমি কেঁদ না—ঘরে খাবার না থাকে আমার কাছে আছে। এই ছাখ তো মা—আজ আ’সবার সময় মাঠ থেকে কেমন ডাগর ডাগর মেটে আলু তুলে এনেছি। দাও তো মা, তুএকটা পুড়িয়ে—আমি আর দাদা তু’জনেই খাব এখন।”

এই পোড়া মেটে আলু খাইয়াই রামসুন্দরের যে কত দিন চলিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু একদিনের জন্যও কেহ তাঁহার মুখে হাসি ছাড়া তুঃখের রেখাটুকুও দেখিতে পায় নাই। কাপড়ের

অভাব—একখানি কাপড়,তাহাও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে উপায়? কি করিয়া পাঠশালায় যাওয়া হয় আর কি করিয়াই বা হাটের কাজ চলে? রামসুন্দর দেখিলেন, পিতাকে বলিয়া কেবল তাঁহার দুঃখের উপর অতিরিক্ত দুঃখের বোঝা চাপান মাত্র। তিনি নিজেই অনভ্যস্ত হস্তে ছুঁই সুতা লইয়া সেই শতগ্রন্থি-যুক্ত কাপড়খানি সেলাই করিতে বসিলেন।

জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব—বাড়ীতে একখানিও কাঠ নাই। রামসুন্দর ভোর হইতে না হইতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া একরাশ গোবর বা ঘুঁটে কুড়াইয়া সকলের উঠিবার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিলেন। কোন দিন কোন দিন বা নীলের ক্ষেতে যাইতেন। নীলকরেরা তাহাদের প্রয়োজনমত যাহা লইবার তাহা কাটিয়া লইয়াছে—অবশিষ্ট গোড়াগুলিই রহিয়া গিয়াছে। রামসুন্দর বহুশ্রমে সেই গোড়াগুলি খুঁড়িয়া তুলিতেন এবং অনেক গুলি জড় হইলে একসঙ্গে আঁটি বাঁধিয়া বাড়ী লইয়া আসিতেন।

দুঃখে কষ্টে রামসুন্দরের দিনগুলি এইভাবে কাটিতে লাগিল। কিন্তু শেষে এমন হইল যে আর চলে না। অর্দ্ধাশনে অনশনে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম—হাটের এতখানি রাস্তা হাঁটিয়া যাইবার সামর্থ্যও বুঝি যায়! পাঠশালায় আর মাহিনা দেওয়া হয় না। দুই আনা দুই আনা করিয়া জমিয়া থোক টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পাঠশালা ছাড়িতে হইল। রামসুন্দরের জীবনের এই অধ্যায়টীই বিশেষ স্মরণীয়। এই উন্নতি অবনতি, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দশ-বৎসরের বালক রামসুন্দর যে প্রখর বুদ্ধিমত্তার, যে অনন্যসাধারণ স্বাবলম্বনের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া রামসুন্দর যখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ তখন ভগবানের কৃপায় একদিনের একটী সামান্য ঘটনা হইতেই তাঁহার জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত হইবার সূচনা হইল। রামসুন্দরের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাসীমাতাঠাকুরাণী কতকগুলি কাঁথা

বিক্রয়ে যে আধুলীটী পাইলেন তাহাই তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে কাজে লাগিতে বলিলেন। এই আধুলী মূলধন লইয়াই রামসুন্দরের ব্যবসা আরম্ভ। প্রথম দিনে ঐ আধুলী হইতে কয়েক আনার পান কিনিয়া ঝিনাদহের হাটে বেচিতে গেলেন। সন্ধ্যার পর হিসাব করিয়া দেখেন দিনটা নিতান্তই বৃথা যায় নাই—আড়াই পয়সা আন্দাজ লাভ হইয়াছে। রামসুন্দর বুঝিলেন এই পান হইতে কিছু হইবার সম্ভাবনা। পরদিনও দেখা গেল, পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আরও আধ পয়সা বেশী লাভ। এইরূপ প্রতিদিনই লাভের মাত্রা একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। কিছুদিন এই ভাবে যায়। ইহার মধ্যে রামসুন্দরের উপার্জ্জন যে দুই এক টাকা না হইয়াছে এমন নহে। তবে সংসারের অসচ্ছলতা যায় নাই—কিছু কমিয়াছে মাত্র। কিছু দিন পরে সুবিধা বুঝিয়া তিনি পান বিক্রয়ের সঙ্গেই লবণ ও গুড়ের বেচাকেনা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে একদিন হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন—খালি পা, পরণে একখানি ছোট

কাপড়, বগলে একটী ভাঙ্গা ছাতা, মাথায় গুড়ের নাগ্‌রী। ঝিনাদহ হইতে আবাইপুরের পথ অনেকটা—অনেকগুলি মাঠ ভাঙ্গিয়া এবং দুই একটী বাঁশ বন ছাড়াইয়া তবে রামসুন্দর বাড়ী পৌছিবেন। বৈশাখ মাস—কথায় বলে "কাল বৈশিখি।" কোন খানে কিছু নাই—হঠাৎ আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল। রামসুন্দর দ্রুত চলিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুদূর গিয়াই ঝড়ে ঠেকিলেন। ভীম বেগে পবনদেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন। মড় মড় শব্দে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কড় কড় শব্দে মাথার উপর মেঘ ডাকিতেছে—এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। রামসুন্দর তখন একটী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়াছেন—মাথার উপর যে কতকগুলি বাঁশ মাটীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ইহা তাঁহার লক্ষ্যই হয় নাই। চলিতে চলিতে সেই বাঁশগুলিতে লাগিবামাত্র তাঁহার মাথার নাগ্‌রীটী মাটীতে ঠিকরাইয়া পড়িল এবং নাগ্‌রীর গুড়টুকুও নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রামসুন্দর এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়

কি করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া এবং বহু কষ্ট-সঞ্চিত অর্থের গুড়খানি নষ্ট হয় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাঁশ ঝাড়ের তলা হইতেই একটী হাঁড়ি কুড়াইয়া লইলেন এবং উহা যেমন তুলিয়া ধরিতে যাইবেন অমনি মহা বিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন হাঁড়ির মধ্যে একটী বড় কড়ি রহিয়াছে। রামসুন্দর কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কড়িটী দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে "রাম, ভাবছিস কি ?—ওই কড়িশুদ্ধ হাঁড়ি নিয়ে বাড়ী যা। তোর ভাল হ'বে—তুই লক্ষপতি হ'বি।"

রামসুন্দর পুলকে শিহরিয়া উঠিলেন এবং ভক্তি-ভরে হাঁড়িটী মাথায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। অদ্যা-বধি শিকদারবংশীয়দের গৃহে ঐ কড়িটী পূত দেব-সামগ্রীর মত সমান ভক্তি ও যত্নে রক্ষিত।

কর্ম্মজীবন ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতেই রামসুন্দরের উন্নতির আরম্ভ। এই সময়ে তাঁহার পূর্ণ যৌবন। লবণ ও গুড় হইতে তিনি ক্রমে তূলার ব্যবসায় ধরিলেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোহাইল পাড়া নিবাসী আরাধন কুণ্ডু তখন তূলার বিখ্যাত মহাজন। রামসুন্দর ব্যবসাসূত্রে এই আরাধন কুণ্ডুর সহিত পরিচিত হইলেন। আরাধন একজন অতি সজ্জন মহাশয় ব্যক্তি। তিনি যুবক রামসুন্দরকে প্রথম হইতেই স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। রামসুন্দরও তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুবক রামসুন্দর ও বৃদ্ধ আরাধনের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ ও আত্মীয়তা জন্মিল। রামসুন্দর বৃদ্ধকে 'কাকা, কাকা' বলিয়া ডাকিতেন—বৃদ্ধ ও তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। এইরূপে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তখনকার দিনে আরাধনের মত

একজন ধনী মহাজনের সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ সুবিধারই কথা। রামসুন্দর এখান হইতে মোটা মোটা টাকার তুলা ধারে পাইতেন এবং উহা আবাইপুর ও সোদপুর প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতেন। পরে আরাধনের টাকা শোধ হইত। এইরূপে তুলার কাজ হইতে রামসুন্দরের বেশ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। কার্য্যের আর একটু সুবিধা হইলে তিনি সোদপুরে একটী মোকাম খুলিলেন এবং এই সঙ্গে চাউলের ব্যবসাও আরম্ভ করিলেন।

এই সময় পশ্চিমে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। অন্নাভাবে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে। একে গরীবের দেশ, তাহাতে অজন্মা। ইহার উপর কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বিবেকশূন্য মহাজনদের অযথা মূল্য-বৃদ্ধিতে চাউলের বাজার আগুন। যথাসময়ে সমস্ত সংবাদই রামসুন্দরের কর্ণে পৌঁছিল। রামসুন্দর সমস্ত শুনিয়া বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, আমি একবার পশ্চিমে যা'ব মনে কর্‌ছি। শুন্‌লাম সেখানে নাকি ভারি কষ্ট।

অনাহারে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। যারা বেঁচে আছে এমন ধরা অনেক লোক নাকি শেয়াল কুকুরের মত কোথায় চারিটি অন্ন পাবে এই ভেবে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাপ মায় নাকি ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে না পেরে তাদের নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছে—" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিলেন "হাঁ, আমি যাব—আর গিয়ে একবার দেখবো সেই পাষণ্ড মহাজনদের, যারা চামারের মত এই সব বেচারী গরীবকে মেরে নিজেদের বাড়ী বালাখানা ক'র্‌ছে! তাদের ব্যবসা মাটী না করি তো আমার নামই মিথ্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেব গরীবদের না মেরেও কি ক'রে পয়সা রোজগার ক'র্‌তে হয়।"

পরদুঃখ-কাতর রামসুন্দর উত্তেজনার মুখে এ সমস্ত কথা বলিলেও উহা কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার যাহা মৎলব তাহাতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন। অবশ্য

তাঁহার এমন অর্থ নাই যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? রামসুন্দর যুক্ত করে ঈশ্বরের স্মরণ লইলেন। খানিকটা এই ভাবে চিন্তা করিবার পর একটা কি মৎলব ঠিক করিলেন এবং ময়লা চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া লক্ষ্মীপুরে প্রসিদ্ধ রায় বাবুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রায় বাবুরা ঐ অঞ্চলের একটী বনিয়াদী ঘর। ধনে মানে তখন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহাদিগের তদানীন্তন বংশধরটি একজন অতি উপযুক্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি প্রিয়দর্শন রামসুন্দরের সৎস্বভাব, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া তাঁহার উপর বড়ই প্রীত ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে টাকা কড়ি কর্জ্জ দিয়াও সাহায্য করিতেন। রামসুন্দর ইঁহার বিশেষ অনুগত এবং অনুগৃহীত।

রায় বাবু সটকায় তামাক টানিতেছেন—রামসুন্দর সটাং তাঁহার খাসকামরায় গিয়া উপস্থিত। রামসুন্দরকে আসিতে দেখিয়াই বাবু মুখের নলটী

পাশে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হে রামসুন্দর, খবর সব ভাল ?—ব্যবসাবাণিজ্য চলছে বেশ ?"

রাম। আজ্ঞে হাঁ—আপনার দয়ায় খবর সবই ভাল।

রামসুন্দর আর অধিক কিছু ভাঙ্গিবেন না মনে করিলেন। তিনি বাবুকে বেশ ভালরূপই চিনিতেন। তিনি নিজে কিছু না বলিলেও বাবু তাঁহার মুখ দেখিয়াই তিনি যে কিছু কাজে আসিয়াছেন বুঝিয়া লইবেন, ইহা রামসুন্দর জানিতেন। সুতরাং বাবু যাহাতে নিজেই কথা পাড়েন এজন্য আর বেশী কথা বলিলেন না।

বাবু আবার তামাক টানিতে লাগিলেন,—পরে রামসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা, রামসুন্দর, তোমার মুখখানা যে বড় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি। ব্যাপার কি ? নূতন ব্যবসা ট্যবসা কিছু আরম্ভ ক'রলে না কি ? বড্ড কি খা'টতে হচ্ছে ?"

রাম। আজ্ঞে ব্যবসা কিছু আরম্ভ করিনি—তবে ক'রবো মনে ক'রছি।

বাবু। কি রকম? কি রকম? আবার কি আরম্ভ ক'রবে হে? বলি বাদ কিছুই দেবে না? তা এ ব্যবসাটা কি রকম হবে শুনি।

রামসুন্দর সোজা কথায় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যক্ত করিলেন এবং শেষে বলিলেন, "পয়সার জন্য যত না হোক এই লোক গুলোকে বাঁচাতে আর কতকগুলো অর্থপিশাচ ব্যবসাদারদের শিক্ষা দিতে এ কাজটা আমাকে ক'রতেই হ'য়েছে। এখন আপনার উপর সমস্ত নির্ভর—বরাবরই আমার উপর আপনার দয়া। খুব বেশী টাকার দরকার না হ'লে আর আপনার কাছে ছুটে আ'সতাম না—আমি সামান্য যে দু'চার পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছি তাতেই চালিয়ে দিতাম।"

বাবু ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন "তা এ'তে টাকা কি রকম প্রয়োজন?"

রাম। আজ্ঞে, টাকাটা কিছু বেশী। আমার মনে হয় এই লাখ খানেক টাকা হ'লেই চ'লবে—অন্ততঃ নব্বই হাজার। টাকার জন্যে আপনি ভা'ববেন

না। আমি মাসখানেকের মধ্যেই ও টাকাটা শোধ ক'রে দেব। আর যদি দরকার হয়—

কথায় বাধা দিয়া বাবু যেন মহা চটিয়াছেন এই ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন "রামসুন্দর, তোমায় আমি লাখটাকা কেন এক পয়সাও দেবনা। তুমি তো সব কর্ত্তে পার দেখতে পাই। আমি তোমায় লাখ টাকা দিয়ে তুমি শোধ দেবে কি না দেবে তাই ভা'বতে যাব, এ যখন তোমার মনে হ'য়েছে তখন তুমি আমায় আরও কত নীচু মনে কর্ত্তে না পার তাতো জানিনে। তার উপর আবার বল্‌ছিলে, 'আর যদি দরকার হয়—' তা হ'লে কি হবে? হাঁ, আমায় সুদ দেবে? কেমন, এই না? জান, অন্য কেউ এসে এ ভাবের কথা বল্‌লে দরওয়ান ডেকে তার গলায় হাত দিয়ে এখান থেকে বার ক'রে দিতাম। তুমি ব'লে পার পেয়ে গেলে। যাও—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নব্বই হাজার নয়—ঐ এক লাখ টাকাই নিয়ে যাও। যখন সুবিধা হয় দিও—কড়ারে আমি কখনও কাকেও টাকা ধার দিইনে।"

রামসুন্দর রায় বাবুর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "বাবু, আপনি দেবতা—আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার অসম্মান করেছি। আমায় ক্ষমা করুন।"

রায় বাবু আসিয়া রামসুন্দরের হাত ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, "যাও! বাজে কথা ছেড়ে দাও। এখন এস, টাকাটা নিয়ে যাবে। চল, ব্যবস্থা ক'রে দিইগে।"

রায়বাবুর নিকট লক্ষ টাকা পাইবার পর রামসুন্দর আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাখরগঞ্জ, নাদন ঘাট, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে চাউল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যে প্রায় লক্ষ মণ চাউল সংগৃহীত হইল। পূর্ব্ব হইতে মৃজাপুরে একটী মোকাম খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত চাউলই রামসুন্দর মৃজাপুরের মোকামে পাঠাইতে লাগিলেন। পশ্চিম প্রদেশে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রামসুন্দর অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

তাঁহার টাকা বেশী—পড়ন কম—মালও অনেক; সুতরাং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা হটিয়া গেল। চাউলের কার্য্য তাঁহার মৃজাপুরে একচেটিয়া হইল। রামসুন্দরের ইহাতে বিস্তর লাভ হয় এবং ইহা হইতেই তিনি তদানীন্তন ব্যবসায়ীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হইলেন।

মৃজাপুরের মোকাম হইতে তিনি আর একটী নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। সস্তায় পশ্চিম দেশীয় তূলা কিনিয়া তিনি কলিকাতা, সোদপুর ও জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উহা পাঠাইতে লাগিলেন। ইহাতেও যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। কার্য্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে মোকামের ভার দিয়া রামসুন্দর দেশে ফিরিলেন। দেশে রামসুন্দর তখন একটী দেখিবার জিনিষ। আত্মীয় অনাত্মীয়ে তাঁহার গৃহ ভরিয়া গেল। সকলের মুখেই রামসুন্দরের সুখ্যাতি। কেহ বলিতেছেন, "আরে, এতো জানা কথা—পড়েই রয়েছে। রামসুন্দর খুড়ো যে একটা মানুষ হ'বে

এতো আমরা গোড়া থেকেই ব'লে আসছি।" আর একজন বলিতেছেন, "রামসুন্দর ভায়ার উন্নতিতে সারা গ্রামটার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।" এই ভাবে পরিচিত অপরিচিত, শত্রু মিত্র, সকলেই রামসুন্দরের যশোগান করিতে লাগিল। পৃথিবীর নিয়মই এই—যাহারা দুঃখের দিনে একবার উঁকি মারিয়াও দেখিবার অবকাশ পায় না, সুখের দিনে তাহারাই আবার পরম মিত্র হয়।

রামসুন্দর দেশে ফিরিবার কিছু দিন পরে চিনির ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং এই কার্য্য হইতেই বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ৺রামগোপাল ঘোষের সংস্রবে আসিলেন। যশোহর, শান্তিপুর এবং গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে লাগিলেন। প্রথম বৎসরেই এই চিনির কার্য্যে তিনি বিস্তর লাভ করেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত রামগোপাল ঘোষের তিনিই প্রধান মহাজন (Banker)। এই কার্য্যে প্রয়োজন হইলে সময় সময় দুই তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত

রামসুন্দরকে বাহির করিতে হইত। রামসুন্দরের বিপুল অর্থের কথা তখন দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার মহাজনী কার্য্যের (Banking business) এরূপ সুনাম হইয়াছে যে সকল ব্যবসাদারই রামসুন্দরের টাকা লইয়া কার্য্য করিবার জন্য ব্যগ্র! এ বিষয়ে অনেক ইংরাজ কুঠিয়াল সাহেবরাও রামসুন্দরের যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত কুঠিয়াল মিঃ কেনী (যাঁহার নামে কুষ্টিয়ার বর্ত্তমান কেনিক বাজারের নামকরণ হইয়াছে) জেম্‌স্ টুইডি এবং মিঃ ওমেন সমধিক প্রসিদ্ধ। সময়ে রামসুন্দরই তাঁহাদের প্রধান মহাজন হয়েন। তাঁহাদের যত টাকার প্রয়োজন রামসুন্দর সমস্তই সরবরাহ করিতেন এবং ঐ টাকা কলিকাতায় Messrs. R. Thomas & Co. (ইহার বর্ত্তমান নাম Messrs, J. Thomas & Co.) Moran & Co. Gisborne & Co., Jardine Skinner & Co. এবং Oriental Bank প্রভৃতির নিকট হইতে হুণ্ডিতে (Draft) টাকা লইতেন। এই মহাজনী

কার্য্যে রামসুন্দর এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

রামসুন্দরের বরাৎ তখন খুলিয়া গিয়াছে। তিনি যে কার্য্য ধরিতেছেন তাহাতেই প্রচুর লাভ—প্রচুর অর্থসমাগম। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া রামসুন্দর আর দুইটী নূতন কার্য্য আরম্ভ করিলেন—উহার মধ্যে একটী কাপড়ের আর একটী নীলের। সৈয়দপুরের নিকটবর্ত্তী রোয়ালমারী গ্রামে কাপড়ের এক বৃহৎ দোকান খুলিলেন; এবং শান্তিপুর, ফরাস ডাঙ্গা, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর টাকার কাপড় আনাইয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। নীলের কার্য্যও বেশ চলিতে লাগিল এবং তিনি সুবিধা বুঝিয়া কলিকাতায় হাঠখোলা অঞ্চলে দেশীয় লোকের উৎপন্ন নীলের এক প্রকাণ্ড আড়ৎ খুলিলেন। চারিদিক হইতে অর্থসমাগম হইতে লাগিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রামসুন্দর ধনী বলিয়া খ্যাত হইলেন।

শেষ জীবন।

আমেরিকার চিন্তাশীল সুলেখক (Emerson) এমার্‌সন্‌ তাঁহার একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"There is always room for a man of force and he makes room for others' "চরিত্রবলে বলীয়ান্‌, অধ্যবসায়ী, দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি নিজের উন্নতির পথ নিজেই করিয়া লয়েন এবং অপরের জন্য পথ করিয়া দেন। রামসুন্দর একটী আধুলি মাত্র মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন—প্রথম দিনে ব্যবসায়ে লাভ করিয়াছিলেন মাত্র আড়াই পয়সা—ব্যবসায় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে অবসর লইবার সময় প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি হইয়াছিলেন। যাঁহারা মূলধনের অভাব স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বনের অন্তরায় মনে করেন, রামসুন্দরের জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহাদের এই অমূলক ধারণা দূরীভূত হইবে এরূপ আশা করা যায়। অপরন্তু, কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া তিনি যাহা

করিয়াছিলেন তাহাতে উল্লিখিত লেখকের উক্তির দ্বিতীয় অংশও যে সত্য তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। এই সময়ে ব্যবসায় বাণিজ্য-প্রচার তাঁহার মুখ্য কার্য্য হইয়াছিল। উপার্জ্জনপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রকেই রামসুন্দর স্বাধীন ব্যবসায় করিতে উপদেশ দিতেন—মূলধনের অভাব শুনিলেই তাঁহাকে নিজের জীবনের ইতিহাস বলিতেন—একান্ত প্রয়োজন হইলে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যও করিতেন। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিয়া, অনেকে সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

রামসুন্দর তাঁহার গ্রামের ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অনেক গৃহস্থকে সুতা কাটিবার জন্য চরকা ও কাপড় বুনিবার জন্য তাঁত ইত্যাদি যোগাইতেন, এবং তাহাদের শ্রমজাত সুতা ও কাপড় নিজে খরিদ করিয়া লইতেন। এই উপায়ে অনেক গৃহস্থের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। ইহাই প্রকৃত দেশ-হিতৈ-ষণা—ইংরাজীতে যাহাকে practical patriotism বলে। আজকাল কাপড় যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে

ও তজ্জন্য জনসাধারণের যেরূপ কষ্ট ও অসুবিধা হইতেছে, তাহাতে রামসুন্দরের প্রবর্ত্তিত উপায় অবলম্বন করিলে তাহার প্রতীকার হইতে পারে। চরকা ও তাঁতের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা যে এই বস্ত্র-বিভ্রাটের মহৌষধ—এমন কি একমাত্র মহৌষধ—ইহা সকলের বুঝিয়া দেখা উচিত।

কিন্তু রামসুন্দরের চেষ্টা ও অধ্যবসায় একমাত্র বাণিজ্য-প্রচারে আবদ্ধ ছিল না। তিনি আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন—ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল পূজা-পদ্ধতি ক্রিয়াকর্ম্মের অনুশাসন আছে, তাহা যথাসাধ্য পালন করিতেন। এই সকল পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপ যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান—মূর্ত্তিপূজা যে ভ্রান্ত নিরর্থক কুসংস্কার নহে—তাহা রামসুন্দর বিশ্বাস করিতেন এবং হিন্দুনামধারী প্রতিবেশী ও অন্যান্য জনসাধারণের এ সম্বন্ধে অনাস্থা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ অনুভব করিতেন। আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত নৈতিক জীবন যে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ—একের উন্নতি

অবনতিতে যে, অপরেরও আনুপাতিক উন্নতি অবনতি অবশ্যম্ভাবী—ইহা একটী অভ্রান্ত সত্য—সকল দেশে সকল যুগেই হইয়া আসিতেছে। নানা কারণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের লোপ হইতেছিল। অভাব দারিদ্র্য যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা রামসুন্দর স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় ক্রিয়াকলাপের পুনরুদ্ধার যে কি কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য এবং তাঁহার নিজের শক্তি যে কত ক্ষুদ্র তাহা রামসুন্দর জানিতেন; তথাপি তিনি এই সাধু কার্য্যে পশ্চাৎপদ না হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাঁহার নানা উদ্যোগের মধ্যে দুই একটী মাত্র উদাহরণ দিব। দুর্গোৎসব বঙ্গীয় হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান উৎসব। কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। রামসুন্দরের নিজগ্রামে ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে পূর্ব্বে যাঁহারা প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এই ক্রিয়া নানা কারণে বন্ধ রাখিয়াছিলেন। রাম-

সুন্দর এখন অনেককে অর্থসাহায্য করিয়া আবার পূজা আরম্ভ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। জাহ্নবীর পবিত্র জল এই পূজায় ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপে প্রধান উপকরণ—না হইলে চলে না। এই জলের বিশেষ অভাব দেখিয়া রামসুন্দর নিজ ব্যয়ে বহুদূর হইতে গঙ্গাজল আনাইয়া অনেক পূজাবাড়ীতে রাখাইয়া ছিলেন। ইহাতে এই অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল।

সাধারণের ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে রামসুন্দরের একাগ্রতা ও অধ্যবসায় এখনও অনেকে গৌরবের সহিত উল্লেখ করেন।

এসকল ছাড়া শেষজীবনে রামসুন্দর নানাবিধ পুণ্য কার্য্য করিয়াছিলেন। দুঃস্থ বিপন্ন লোকের উপকারের জন্য তাঁহার অনেক দানের কথা শুনা যায়। অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সহিত অদ্যাপি জড়িত রহিয়াছে।

পারিবারিক বিবরণ ও মৃত্যু।

এইখানে রামসুন্দরের পারিবারিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। রামসুন্দরের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর নাম লক্ষ্মীমণি—দ্বিতীয়া দুর্গামণি। লক্ষ্মীমণির গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে—নাম নীলমাধব। তাঁহার উন্নতির প্রথম অবস্থাতেই লক্ষ্মীমণির মৃত্যু হয়। প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে রামসুন্দর শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। কালের শীতল প্রলেপে শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে তিনি দুর্গামণিকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই গর্ভে তাঁহার ছয় পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্র-দিগের নাম—বেণীমাধব, যাদব, বিশ্বম্ভর, অক্রুর, ক্ষেত্র, ধ্রুব। যখন কনিষ্ঠ ধ্রুব দুই বৎসরের শিশু এবং ক্ষেত্রর বয়স ছয় বৎসর মাত্র তখন রাম সুন্দরের অবসরের সময় আসিল—পৃথিবীর পরপার হইতে কালের ডাক পড়িল। রামসুন্দর পীড়িত

হইলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর—পরে উহা সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। কবিরাজ আসিয়া নাড়ী দেখিয়া মুখ বাঁকাইলেন। পরে গম্ভীর মুখে বলিলেন, "জীবনের আশা নাই, শীঘ্রই দীপ নির্ব্বাণ হবে।" তৎক্ষণাৎ সজ্ঞানে ৺ গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই নিদারুণ বার্ত্তা গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। সে এক মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য! গ্রামের ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র এমন কি কুলী মজুরেরা পর্য্যন্ত আপন আপন কাজ ছাড়িয়া রামসুন্দরকে শেষ দেখা দেখিতে আসিল। সকলের মুখেই এক কথা, "আজ সত্য সত্যই আমরা অনাথ হ'লাম—আবাইপুরের আজ মহা দুর্দ্দিন। দেশের মাথা—গরীবের মা-বাপ—ধনীর সহায় রামসুন্দর আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'ল্‌ল।"

অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বে এই করুণ দৃশ্যটী স্মরণ করিলে এখনও চক্ষে জল আসে—কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। ভাষায় এমন শব্দ নাই—শব্দে এমন ঝঙ্কার নাই যে যাহাতে সাধারণের এই আন্তরিক শোকানুভূতির

সম্যক্ পরিচয় হইতে পারে। ইহা বুঝি শুধু বুঝিবার, অনুভব করিবার—দেখাইবার নহে। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ হইতে যে হাহাকারধ্বনি একদিন আবাইপুরের জলে স্থলে সর্ব্বত্র কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল, বুঝি আন্তরিকতার হিসাবে, প্রাণস্পর্শী ব্যথার দরদে, তাহা অতুলনীয়।

গঙ্গাযাত্রার পর পথেই গোঁসাই দুর্গাপুরে সন ১২৭০ সালের ২৫ শে বৈশাখ তারিখে (কবিরাজের কথাই ফলিয়া গেল) রামসুন্দর পবিত্র হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে চিরতরে চক্ষু মুদিলেন—বঙ্গের বাণিজ্য-আকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল !

যথাসময়ে উপযুক্ত পুত্রেরা পিতার সম্ভ্রমোচিত শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। এরূপ সমারোহের শ্রাদ্ধ যশোহর জেলায় খুব কমই হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। পরে পিতার স্মৃতি-রক্ষার জন্য বিশ্বম্ভর-প্রমুখ তাঁহার পুত্রগণ বহু ব্যয়ে আবাইপুর গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পিতার নামানুসারে

উহার Ramsunder Institution নামকরণ করেন।

রামসুন্দরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সুচরিত্র ধ্রুবচন্দ্র এই স্কুলের বর্ত্তমান সেক্রেটারী। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় এবং তৎভ্রাতা কর্ম্মবীর বিচক্ষণ ক্ষেত্রমোহনের তত্ত্বাবধানে উহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং রামসুন্দরের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

সন ১৩০৪ সালে বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও এই মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার কৃতী পুত্রগণ Ramsundar Sikdar & Co. নামক কলিকাতায় এক বিখ্যাত পাটের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সন ১৩১৯ সালে উক্ত কোম্পানীর পাটের ট্রেডমার্ক গুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধার্য্য হয় এবং আজ পর্য্যন্তও উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠই আছে। এইরূপে দেশবিদেশে রাম-সুন্দরের নাম বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রামসুন্দর এই নামে কি মাহাত্ম্য আছে জানি না; কিন্তু এই নামের গুণেই নিউ ইয়র্ক এবং জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে

অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীরা কলিকাতায় আসিয়া উক্ত ট্রেডমার্ক গুলির ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং শুধু বঙ্গদেশে কেন পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে রামসুন্দরের প্রতিষ্ঠা। ভগবানের আশীর্ব্বাদে রাম-সুন্দরের নাম কালের বুকে অমর অক্ষয় হইয়া থাকুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

স্মরণীয় ঘটনা।

দয়া।

"Getting money is not all a man's business : to cultivate kindness is a valuable part of the business life"—Dr. Johnson.

দয়ার প্রতিমূর্ত্তি রামসুন্দর প্রকৃত দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন এবং অর্থ উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও একটী অবশ্য করণীয় কার্য্য জ্ঞান করিতেন।

কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে রামসুন্দর বাড়ী ফিরিতেছেন। সন্ধ্যার আর বেশী বিলম্ব নাই। সঙ্গে লোকজন অল্প—নৌকা নদীর কিনারার নিকট দিয়াই চলিয়াছে। রামসুন্দর ছইএর বাহিরে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছেন। খালি গা—সুন্দর মুখখানির উপর সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু আসিয়া পড়িয়াছে। রামসুন্দর নিবিষ্টমনে পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। এমন সময় হঠাৎ কাণে গেল কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে:—"ওগো আমাদের কি হবে গো—সে তো শুধু নিজে মলো না—আমাদেরও মেরে গেল।" রামসুন্দর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই নৌকা

বাঁধিতে বলিয়া খালি পায়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিছু দূর আসিয়া দেখেন, একটী স্ত্রীলোক বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে; পাশে দু'টী শিশু—একটী চার বৎসরের, আর একটী দুই বৎসরের—তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। রামসুন্দর নিকটে আসিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা কাঁদ কেন? আমি তোমার সন্তান—আমায় তুমি পুত্রজ্ঞানে সমস্ত খুলে বল।"

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কি আর ব'লব বাছা! আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। আজ দুপুরেই ভগবান আমার সিঁথের সিঁদুরটুকু মুছে দিয়েছেন। বাবা, গরীব আমরা। ঘরে যা কিছু ছিল—রোগের চিকিৎসায় তা'র শেষ পয়সাটী পর্য্যন্ত খরচ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এত করেও বাঁচাতে পারলাম না। ভাঙ্গা বাড়ী খানা পর্য্যন্ত শেষে বাঁধা প'ড়লো। পাওনাদার এত দিন রয়ে রয়ে আজ সকালে এসে ব'লে গিয়েছে আজ সন্ধ্যার মধ্যে তার পাওনা টাকা মিটিয়ে না দিলে সে আমাদের

ভিটে-ছাড়া ক'রবে। এখন এ অবস্থায় এ গুঁড়ো দু'টুকরোকে কি বা খাওয়াই আর কি দিয়ে দেনা শুধেই বা মাথা গোঁজবার ভিটেটুকু বজায় রাখি? তাই, বাবা, কাঁ'দতে কাঁ'দতে ভগবানকে জানাচ্ছি।"

রামসুন্দর গিয়া দুই কোলে দুইটী শিশুকে তুলিয়া লইলেন—পরে বলিলেন, "চল তো, মা, আমার সঙ্গে। তোমার কোন ভাবনা নেই—আমি তোমার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে দিচ্ছি।"

রামসুন্দরের কথাগুলির মধ্যে এমন একটী আন্তরিকতার ভাব ফুটিয়া উঠিল যে রমণী নিশ্চিন্ত মনে এই অপরিচিতের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। খানিকটা আসিয়া তাঁহারা একটী ভাঙ্গা মেটে ঘরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, এই আমার স্বামীর ভিটে।"

রামসুন্দর বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে রামসুন্দরকে দেখিয়া অনেকগুলি গ্রামবাসী

আসিয়া জুটিয়াছিল। রামসুন্দর তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"শু'নলাম এই বাড়ীখানা বাঁধা আছে।"

একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, বন্ধক আছে—আমার কাছেই আছে।"

রাম। কত টাকায়?

লোক। আজ্ঞে একশো টাকায় ছিল। এখন সুদে আসলে প্রায় দেড়শো টাকা হয়েছে।

রাম। বাড়ীর কর্ত্তাতো মারা গিয়েছেন। এখন শোধ দেবেন কে? দুটী অপোগণ্ড শিশু আর—

লোকটী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন, থামুন, মশাই—আপনার এত মাথা ব্যথায় কাজ নেই। আমার কাজ আমি বেশ বুঝি। আমি যেমন ক'রে পারি ঐ টাকা আদায় ক'রব।"

রাম। যেমন করে পারি! তার মানে এদের ভিটে ছাড়া ক'রবেন—বাড়ীটা নিলেম করে নেবেন?

লোক। হাঁ, আলবত নেব। আটকায় কে? জানেন আমি এ গাঁয়ের মোড়ল?

রাম। মোড়ল মশাই, আপনি মানুষ না

কসাই ? বাড়ীতে একটা মড়া ম'রেছে—বিধবা মেয়ে-টীর এখনও চোখের জল শুকোয় নি, আর আপনি এসে তার বাড়ী চড়াও হয়েছেন। আপনার চোখে কি মানুষের চামড়া পর্য্যন্ত নেই ? থাক্—আপনাকে গাল দিতেও ঘৃণা হয়। হাঁ—আসুন আমার সঙ্গে—চলুন আমার নৌকায়—আপনার সমস্ত টাকা শোধ করে দিচ্ছি। রামসুন্দর শিকদার আমার নাম—ঐ স্ত্রীলোক্‌টীকে আমি মা বলেছি। আমিই দেনার টাকা শোধ দিয়ে আমার মা'র নামে এই বাড়ী লেখা পড়া করে দেব।

আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া রামসুন্দর নৌকায় গিয়া মোড়লের হাতে প্রতিশ্রুত দেড়শত টাকা দিলেন এবং বাড়ীর কর্জ্জকবলাটী ফিরাইয়া লইলেন। সেদিন আর সেখান হইতে আসা হইল না। পরদিন স্ত্রীলোকটীর নামে দলীল পাকা করিয়া দিয়া এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার পর রামসুন্দর ঘাটে আসিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন।

বন্ধুবাৎসল্য ।

Old friends are best. King James used to call for his old shoes; they were easiest for his feet.—Selden.

বন্ধুবৎসল রামসুন্দর পুরাতন বাল্য-বন্ধুদের প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট ছোট বড় ছিল না। এই স্বার্থহীন বন্ধুবাৎসল্য আজকাল একান্তই দুর্লভ।

শীতের রাত্রি। রামসুন্দর কাজকর্ম্ম সারিয়া কলিকাতার গদীতে বসিয়া আছেন। হাতে হুঁকা—মধ্যে মধ্যে তামাক টানিতেছেন। এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল একটী লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে চায়। রামসুন্দর লোকটীকে আনিতে বলিয়া দিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চাকর ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে সেই লোকটী। মুহুর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিয়াই রামসুন্দর শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া আগন্তুকের হাত ধরিলেন এবং বলিলেন, "আরে কেও, হলধর যে?—বলি, ভাল আছ?—বাড়ীর সব খবর ভাল?—মা ভাল আছেন?"

আগন্তুক বলিয়া উঠিল—"আরে দাঁড়াও ভায়া,

এক একটা করে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দিচ্ছি—একসঙ্গে এতগুলো কথার উত্তর এখন দেই কি ক'রে বল দেখি ?"

তার পর লোকটী ওরফে হলধর একে একে সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিল।

রামসুন্দর তখন যেন মহা খুসী। হলধরকে পাশে বসাইয়া তাহার হাতে হুঁকাটী দিয়া বলিলেন—"তোমাকে পেয়ে আজ কত কথাই মনে পড়ছে! ওঃ—সে যেন আজ একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে! তুমি আর আমি সেই গুরুমশাইয়ের পাঠশালে এক সঙ্গে প'ড়তে যেতাম। পাঠশালা থেকে এসে দু'জনে কত খেলাই খেলেছি! পুকুরের পাড়ে—বাগানের মধ্যে—নদীর ধারে কত ছুটাছুটোই করেছি। এমন দিন গিয়েছে যে সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিয়েছি। আবার তুমিও কতদিন আমাদের বাড়ী এসে নিজের বাড়ীর কথা ভুলে গিয়েছ। তখন আমার মা বেঁচে—

বলিতে বলিতে মাতৃভক্ত রামসুন্দরের চক্ষে জল

দেখা দিল। রামসুন্দর ক্ষিপ্র হস্তে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "তোমায় আর আমায় তিনি কখনও ভিন্ন দেখতেন না। আমাদের গরীবের সংসার। তিনি বসে থেকে হাতে ক'রে আমাদের দুজনের মুখে কত দিন শুধু পান্তভাতের আমানি তুলে দিয়েছেন, আর কাপড়ে চোখ মুছেছেন। কিন্তু তুমি আর আমি হাসি মুখে কত সুখেই সেই নুন দেওয়া পান্তভাত খেয়েছি! আজ এই এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও সমস্ত কথাগুলো যেন চোখের উপর ভাসছে। যাক্ সে সব কথা—এখন বল তো, হলধর, হঠাৎ এত রাত্রে কি মনে করে?"

হলধর। মনে আর কি করে? এই শুনলাম তুমি নাকি কাল মৃজাপুরের মোকামে রওনা হবে। তা যদি সেখানে গিয়ে আমায় একখানি ভাল পশ্চিমে আলোয়ান পাঠিয়ে দাও তাহ'লে কলকাতার বাজে জিনিষগুলো আর কিন্‌তে হয় না। আর যদি পার, পেঁচো পোদ্দারের জন্যেও একখানা দিও—সেও সেদিন ব'ল্‌ছিল।

রাম। বেশ, একখানা তোমার—আর এক খানা পেঁচো পোদ্দারের। এই দুখানা তো—কেমন? কিন্তু নফর কলু, কেষ্টা কৈবর্ত্ত, রেমো জেলে—এদের কি হবে? এরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে না কি? একটা কথা বলি, হলধর—রাগ ক'র না ভাই। তুমি আর পেঁচো পোদ্দার যেমন—এরাওতো তেমনই। ছেলেবেলায় এদের না হ'লে যে ভাত হজম হ'ত না। ঝগড়া ক'রে পরস্পরে মারামারি ক'রেছি—তখনই আবার চোখের জলে সে ঝগড়া মিটমাট হয়েছে। তারা যে আমার জীবনের কি, তুমি তো সবই জান, ভাই। এখনও এক এক বার মনে হয় এই সব ধন দৌলতের মায়া কাটিয়ে তাদের সঙ্গে সমান হ'য়ে আবার আগেকার মত গলা ধরাধরি করে বেড়াই।

রামসুন্দরের কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল। আরও দুই একটী কথার পর হলধর বিদায় লইল। পরদিন রামসুন্দর মৃজাপুরে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে মৃজাপুর হইতে রামসুন্দর-প্রেরিত শাল, আলোয়ান,

লেপ, তোষক—প্রভৃতিতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাল্য বন্ধুদের গৃহ ভরিয়া গেল।

ক্ষমাশীলতা।

Yes to have power to forgive
Is empire and prerogative ;
And 'tis in crown a nobler gem
To grant a pardon than condemn.

S. Butler.

চিরন্তন বিনয়নম্র রামসুন্দর ক্ষমতার দর্পে অন্ধ হইয়া ক্ষমাপ্রার্থীকে কখনও বিমুখ করিতেন না এবং অনেক স্থলে প্রার্থনার পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

যশোহর মাগুরা সবডিভিশনের অন্তর্গত আঠার-খাণ্ডানিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান এক সময়ে রাম-সুন্দরের নিকট বিনা হ্যাণ্ডনোটে প্রায় সহস্রাধিক টাকা কর্জ্জ লয়েন। টাকাটা হাওলাত হিসাবে লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই সরল রামসুন্দর ইহার জন্য হ্যাণ্ড-নোট লইবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই; আর ব্রাহ্মণকে টাকা দিয়া এ সমস্ত তিনি কখনও লইতেন না। ব্রাহ্মণ দেবতার অংশ—তাহাতে নীচতা স্পর্শ করিবে ইহা হইতেই পারে না।

টাকা দিবার নির্দ্দিষ্ট সময় চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের দেখা নাই—টাকা শোধ দিবারও নাম নাই। কর্ম্ম-চারীরা রামসুন্দরের নিকট প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে

আসিয়া ব্রাহ্মণের ব্যবহারের কথা বলিতে লাগিল এবং এ ক্ষেত্রে নালিশই যুক্তি আকার ঈঙ্গিতে ইহাও বুঝাইয়া দিল। রামসুন্দর ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না।

এইরূপে ছয় মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে উক্ত ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশার একশেষ। অগ্নিদাহে বাস্তু-ভিটাটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—নগদ টাকাকড়ি যেখানে যাহা ছিল বাড়ীর সঙ্গে সমস্তই অগ্নিদেবের উদরসাৎ হইয়াছে। বিপদের উপর বিপদ—আজ দুইদিন হইল ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেটীর কলেরা—এখন যায় তখন যায়। ঘরে এমন পয়সা নাই যে যাহাতে ঔষধ বা পথ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কপালে হাত দিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন আর আপন মনে কি ভাবিতেছেন এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "দাদাঠাকুর, বাড়ী আছ গো?"

ব্রাহ্মণ শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া দেখে উঠানে দাঁড়াইয়া রামসুন্দর! ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিল না—ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং

রামসুন্দরের নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "রাম, আমায় ক্ষমা কর ভাই।"

রামসুন্দর বলিলেন, "দাদাঠাকুর, তোমার দোষ কি যে তার ক্ষমা? দোষ বরং আমার যে একটা তুচ্ছ টাকার মামলা নিয়ে তোমার এই এত বড় একটা বিপদ—সেই যে সেদিন বাড়ী খানা পুড়ে গেল—সে সময় একবার উঁকি পর্য্যন্ত মেরে দে'খলাম না। যাক্ সে সব কথা—এখন ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। আমি আ'সবার পথে কবিরাজ বৈদ্যদা'কে ডেকে এসেছি—তিনি এলেন বলে।"

যথাসময়ে কবিরাজ আসিয়া রোগী দেখিলেন; পরে টিকি নাড়িতে নাড়িতে বাহিরে আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "জীবনের আশা খুবই অল্প—একবারে নিদানে পৌঁচেছে।"

রামসুন্দর কবিরাজের হাতদু'টী ধরিয়া ব্যগ্র আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বৈদ্যদা'—তোমার হাতে ধরছি—ভুতোকে আমার বাঁচাতেই হবে। তুমি মনে কর'লেই পা'রবে। টাকার জন্য ভেবো না—

যত টাকা হয় আমি দেব। দেখো, শেষে যেন ধর্ম্মের কাছে আমায় দোষী হ'তে না হয়। তা হ'লে মলেও সে আক্ষেপ যাবে না। আমার মনস্তাপই যে ব্রাহ্মণের সমস্ত বিপদের কারণ হয়েছে, একথা ভা'বতেও আমার বুক ফেটে যাবে।"

বিরাজের চিকিৎসার গুণে এবং ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মণের পুত্র এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

রামসুন্দর কবিরাজকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিলেন এবং নিজ ব্যয়ে ব্রাহ্মণের নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

নির্ভীকতা।

There was a quenchless energy
A spirit that could desire
The deadliest form that death could take
And dare it for the daring's sake.

Landon.

কর্ম্মবীর রামসুন্দরের নির্ভীকতা যুদ্ধজয়ী মহাবীরেরও অনুকরণীয়।

চৈত্রমাস—কাটফাটা. রৌদ্র। বেলা দ্বিপ্রহর। রামসুন্দর হাট হইতে ফিরিতেছেন। মাঠের ভিতরের রাস্তাটী একটু সোজা হয় বলিয়াই রামসুন্দর মেঠো পথেই চলিয়াছেন। বাড়ী পৌঁছিবার এখনও প্রায় অর্দ্ধেকপথ বাঁকি, এমন সময় রামসুন্দর দেখিলেন একজন লোক মাঠের মধ্যে একটী আমগাছের তলায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন লোকটী পীড়িত। রামসুন্দর কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি এখানে পড়ে কেন? তোমার বাড়ী কোথায়, কি হয়েছে?

লোকটী যেন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সকলের মুখেই এক কথা—কি হয়েছে? সেই সকাল থেকে উত্তর দিতে দিতে আমার গলা পড়ে গেল। কিন্তু উত্তর শুনে আর কেউ দাঁড়ায় না। আমার নিশ্বাসের ভয়ে যেন তারা ছুটে পালায়।

আর না পালিয়েই বা ক'রবে কি? সাক্ষাৎ যম বসন্তরোগের বাতাসকেও ভয়! বাপু, আমায় যমে ধরেছে। যাক্, শোন—গ্রাম আমাদের এখান থেকে দুক্রোশ পথ—নাম মোনসাপোঁতা। সকালে জ্বর-গায়েই না বুঝে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছি—পথে এই বিপদ। এখন আর ন'ড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই। বুঝি এই মাঠেই প্রাণ যায়।"

রামসুন্দর দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "বাপু, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।"

লোকটী রামসুন্দরের কথা শুনিয়া যেন কেমন হইয়া গেল—বলিল, "কেন, বাছা, পরের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আন! এ রোগ বড় ছোঁয়াছে—একবার ধরলে আর রক্ষা নেই।"

রাম। রক্ষা নেই—প্রাণ যাবে! কেমন এই তো? আজ যদি তোমায় বাঁচাতে গিয়ে আমার এই প্রাণটাই যায়, তাহ'লে দুনিয়ার কোন ক্ষতিই হবে না। আর যদি তোমাকে কোন রকমে বাঁচাতে

পারি তা হ'লে তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের হাসিমুখ কল্পনা কর্‌তে কর্‌তে সুখে মর'তে পা'রবো।

উন্নতবপু, বলিষ্ঠ রামসুন্দর লোকটীকে আর দ্বিতীয় কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া নির্ভয়ে তাহাকে কাঁধের উপর উঠাইয়া লইলেন এবং মোনসাপোঁতার পথ ধরিলেন।

দুই দিন পরে রামসুন্দর বাড়ী ফিরিলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলে ভাবিয়াই আকুল। পরে রামসুন্দরের মুখে যখন তাঁহারা আসল ঘটনাটী শুনিলেন তখন আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

সত্যনিষ্ঠা।

I love to tell the truth and shame the devil—Dean Swift.

সত্যনিষ্ঠ রামসুন্দর প্রাণ দিয়া সত্যকে ভাল বাসিতেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মিথ্যাকে ঘৃণা করিতেন।

মিথ্যবাদী, এমন কি তাঁহার সম্পর্কীয়দের সহিতও সংশ্রব রাখিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইত।

ব্যবসা বাণিজ্যসূত্রে বাধ্য হইয়া রামসুন্দরকে মধ্যে মধ্যে মামলা মোকর্দ্দমা করিতে হইত। এক সময় এইরূপ একটী মামলায় তাঁহার স্ত্রীর খুড়া-সম্বন্ধীয় এক ব্যক্তি বিপক্ষ পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। সাক্ষীর ডাক হইলে তিনি কাঠ-গড়ায় দাঁড়াইয়া হলফ করিয়া মিথ্যা বলিলেন। রামসুন্দর সত্যের এই ভীষণ অপলাপ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। যাহা হউক, হাকিমের ন্যায় বিচারে মোকর্দ্দমায় রাম-সুন্দরেরই জয় হইল: কিন্তু জয়ের কোন চিহ্নই তাঁহার মুখে নাই। তিনি গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরি-লেন। পথে কাহারও সহিত কথাও কহিলেন না। স্ত্রী তাঁহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে

তাঁহাকে দেখিবামাত্র পা ধুইবার জল এবং গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। রামসুন্দর সেদিকে দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত না করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার ছোঁয়া জিনিষ নেওয়ায় আমার পাপ আছে। যে বংশের কর্ত্তা হলফ ক'রে আদালতে মিথ্যা বল্‌তে পারে সে বংশের আর সকলে তার চেয়ে ভয়ানক আরও কত মিথ্যার সৃষ্টি ক'র্‌তে পারে তা জানিনে—আমি সে বংশের সঙ্গে সংশ্রব রাখাও পাপ মনে করি। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

সত্যের এই অন্ধ ভক্ত রামসুন্দর সত্য সত্যই ছয়মাস কাল স্ত্রীর মুখদর্শন পর্য্যন্তও করেন নাই।

উদ্যোগ।

Idleness is the key of beggary and the root of all evils—Spurgeon.

পরিশ্রমী রামসুন্দরের সমগ্র জীবন পুরুষোচিত উদ্যোগের একটা জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি আলস্যকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং সাধ্য হইলে অলস ব্যক্তিকে কঠিন শাস্তিতে তাহার চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট নিজ পুত্রেরও মার্জ্জনা ছিল না।

বর্ষাকাল—রামসুন্দর নদীতে স্নানে যাইতে ছিলেন, এমন সময় দেখেন কতকগুলি জ্বালানি কাঠ উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে কাঠগুলি যেন রান্নাঘরের মধ্যে তুলিয়া রাখা হয়, নচেৎ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যথাকালে স্নানের পর বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন যেখানকার কাঠ সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে এবং পুত্র নিশ্চিন্তমনে তাস খেলায় মত্ত। দেখিয়াই রামসুন্দর জ্বলিয়া উঠিলেন; বেলা দ্বিপ্রহরে আপনার নির্দ্দিষ্ট কাজ ফেলিয়া এই আলস্যের অভিনয়ে তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন এবং

তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আদেশ করিলেন—"যাও, ঐ কাঠের বোঝা মাথায় করে গ্রামের চারিধার প্রদক্ষিণ করে এস। আর স্মরণ রেখো জীবনে বারদিগর যেন এরূপ ঘটনা আর না ঘটে। যাও।"

পুত্র অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখে জল—মুখে কথা নাই। ইচ্ছা এই কঠোর আদেশ প্রত্যাখ্যানের জন্য পিতার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করে কিন্তু সাহসে কুলায় না।

ঘটনা শুনিয়া রামসুন্দরের গৃহিণী আসিয়া পুত্রকে ক্ষমা করিবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া পড়িলেন। রামসুন্দর অচল অটল। তিনি বলিলেন—"একবার যে কথা মুখ দিয়ে বা'র করেছি—তা ক'রতেই হবে—অন্যথা নেই। আমার বাড়ীতে আলস্যের প্রশ্রয় চ'লবে না।"

বাধ্য হইয়া সেই দ্বাবিংশ-বয়স্ক পুত্রকে পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইল।

আড়ম্বর-শূন্যতা।

Beauty armed with virtue bows the soul
With a commanding but sweet control.

—Percival

প্রিয়দর্শন রামসুন্দরের সাজ পোষাকের কোন রকম জাঁক জমক ছিল না; কিন্তু তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যে পরিচিত অপরিচিত সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব তাঁহার আকৃতিতে স্বতঃ পরিস্ফুট ছিল এবং অন্তরের সৌন্দর্য্যও তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিত।

রামসুন্দর একবার সস্ত্রীক ৺পুরীধামে যাইতেছেন। আজকালকার মত তখনকার দিনে রেলের সুবিধা হয় নাই—সুতরাং পথের কষ্ট সহজেই অনুমেয়।

সারাদিন হাঁটিবার পর তাঁহারা একটী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নদীটী পার হইবার জন্য ঘাটের পাটনীকে ডাকিলেন। পাটনী আসিয়া তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে নৌকায় লইয়া গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা পারে আনিয়া রামসুন্দরের সম্মুখে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল "বাবু, গরীবের বখ্‌শীশ।"

রামসুন্দর বলিলেন, "বাবা—আমি সামান্য লোক, তোমাকে বখ্‌শীশ দিয়ে খুসী করি এমন ক্ষমতা আমার কই ?"

পাটনী জিব কাটিয়া বলিল, "বাবু, ও কথা বলবেন না—আপনি রাজা লোক। নইলে সামান্য গরীব লোকের কি আপনার মত চেহারা হয় ? হুজুর, আগুন কি কখন ন্যাকড়া-চাপা থাকে ? আপনি পরিচয় না দিলেও আপনার ওই টানা চোখ, ছবির মত মুখ—ফ্যালোয়া কপাল—আপনার আসল পরিচয় দিয়ে দিচ্ছে। বাবু, আপনার চেহারাতেই মালুম—আপনি লক্ষপতি।"

অন্যান্য দুই চারিটী কথার পর রামসুন্দর উপযুক্ত বখ্‌শীশে পাটনীকে খুসী করিয়া নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

ন্যায়পরতা

Impartiality holds the scales of justice with a firm and even hand.

—E. Davies

ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি রামসুন্দর জীবনে কখনও অন্যায়ের ছায়া স্পর্শ করিতেন না। বিবেক এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধির সাহায্যে অতি কূট বিষয়গুলিরও যথাযথ ন্যায়-সংগত মীমাংসা করিতেন।

নরাইলের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রতন রায়ের নাম বাংলায় সুপরিচিত। এক সময়ে তাঁহার দুই বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার মধ্যে একটী জমি লইয়া গোলযোগ বাধে। দুইজনেই রতন বাবুর নিকট আসিয়া পড়িলেন এবং তিনি ইহার একরূপ মীমাংসাও করিয়া দিলেন; কিন্তু উহা তাঁহাদের কাহারও মনঃপূত হইল না। রতন বাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বুঝিলেন ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইবে। অবস্থা যখন এইরূপ তখন দৈববলে একদিন ব্যবসাসূত্রে দু'জনেই রামসুন্দরের গদীতে উপস্থিত। কথায় কথায় রামসুন্দর পূর্ব্বোক্ত গোলযোগের কথা পাড়িলেন এবং পরামর্শচ্ছলে ইহা লইয়া তাহাদিগকে আদালতে যাইতে

নিষেধ করিলেন। ফলে দুপক্ষের সম্মতি ক্রমে তিনিই উহার সালিশী হইলেন।

রামসুন্দর দুই চার কথায় ইহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। দু'পক্ষই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া প্রস্থান করিল।

রতন বাবু ঘটনাটী শুনিলেন। পর দিবস কোন সংবাদাদি না দিয়াই একবারে সশরীরে রামসুন্দরের গদীতে আসিয়া উপস্থিত। রামসুন্দর সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রতন বাবু স্মিত মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কিহে, রামসুন্দর, তুমি কি কোন যাদু টাদু জান না কি? আমি—রতন রায়—যাতে অপারক তুমি একদিনে তার মীমাংসা করে দিলে! আমি শুনে আর স্থির থা'কতে পা'রলাম না। ভাবলাম দেখে আসি, এই রামসুন্দর লোকটী কেমন—সত্য সত্যই কোন যাদু জানে কি না?"

পরে রামসুন্দরকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিহে, দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন?—বস।

রামসুন্দর একটু জড়সড় হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনি জমিদার—আমি সামান্য প্রজা। আপনার সম্মুখে বস্‌লে যে বেয়াদবী হবে।"

উত্তরে কথা না বলিয়া রতন বাবু রামসুন্দরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন এবং বলিলেন "হাঁ, প্রজা—প্রজাই বটে। কিন্তু আমার এই বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে তোমার মত আর দু'টী নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমার মত প্রজা নিয়ে যেন জন্ম জন্ম জমিদারী করি।"